জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস ২০২৩

স্মার্ট বাংলাদেশের প্রত্যয়, দুর্যোগ প্রস্তুতি সবসময়

বিশেষ ক্রোড়পত্র

এসকেএস ফাউণ্ডেশন

স্মার্ট হোক দুর্যোগ প্রস্তুতি

দুর্যোগের ঘটনা ও মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলছে। এমন পরিস্থিতিতে দুর্যোগের প্রস্তুতি নিয়েই আমাদের চলতে হচ্ছে এবং হবে। আশার কথা হলো- আমরা দুর্যোগের পূর্বাভাস পাচ্ছি এবং প্রস্তুতি নিতে পারছি। তবে দুর্যোগের পূর্বাভাস দেয়া ও পাওয়ার মধ্যে একটা দূরত্ব রয়েছে বলে আমাদের দুর্যোগ প্রস্তুতিতে একটা ঘাটতি থেকে যাচ্ছে।

রেডিও, টেলিভিশন,পত্র-পত্রিকা মাধ্যমে প্রচারিত দুর্যোগের পূর্বাভাসগুলো মূলত সামগ্রিক হয়ে থাকে। সামগ্রিক হওয়ায় দুর্যোগের পূর্বাভাসগুলো কোনো বিশেষ অঞ্চলের সুনির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী ব্যবহার করতে পারছেন না। আবার যাদের জন্য এই দুর্যোগের পূর্বাভাস, তারা সাধারণত থাকেন দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে। অনেক ক্ষেত্রেই গণমাধ্যমগুলোর প্রচার সীমানার বাইরে। আবার আবার বার্তা পৌছালেও দুর্যোগের স্বরূপ ও তার মাত্রা সম্পর্কে তাদের সম্যক ধারণা নাই। ফলে তাদের প্রস্তুতিও তেমন থাকে না।

একেকটি দুর্যোগ যেহেতু একেকটি অঞ্চলে, একেকটি সময়ে সংগঠিত হয়, তাই দুর্যোগের সেই আগাম বার্তাগুলো সুনির্দিষ্ট অঞ্চলের সুনির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর কাছে পৌছাতে পারলে তাদের দুর্যোগের প্রস্তুতিও স্মার্ট হবে। বর্তমানে তথ্য-প্রযুক্তির কল্যাণে অনেক দুর্যোগের পূর্বাভাস আমরা স্মার্টলি পেয়ে থাকি। তবে সেটি হয়তো আমরা স্মার্টলি পৌঁছে দিতে পারছি না। মুঠোফোন এখন সবার হাতে হাতে। মুঠোফোনের মাধ্যমে দুর্যোগের বার্তাগুলো সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারলে দুর্যোগ প্রস্তুতি অনেকটা কার্যকর হতে পারে। তবে এতে কিছুটা ঝুঁকিও রয়েছে, কারণ পূর্বাভাসের পরিভাষাগুলো সাধারণ মানুষের কাছে এখনো সেইভাবে বোধ্যগম্য নয়।

দুর্যোগ প্রস্তুতিতে এসকেএস ফাউণ্ডেশন সরকারী, বেসরকারী ও উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে নিয়ে কাজ করছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোকে কার্যকরী ও শক্তিশালী করা। দুর্যোগের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে দুর্যোগ-প্রবণ অঞ্চলে স্বেচ্ছাসেবক তৈরি, তাদের প্রশিক্ষণ ও উপকরণের ব্যবস্থা করা। পাশাপাশি প্রকল্প অংশগ্রহণকারীদের সাথে বিভিন্ন সভার মাধ্যমে দুর্যোগ প্রস্তুতিতে তাদের সচেতন করা। বর্তমানে দুর্যোগের বিশেষ করে বন্যার পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য "ভয়েজ কল ম্যাসেজ" পাঠানোর প্রক্রিয়ায় এসকেএস অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে কাজ করছে। স্মার্ট বাংলাদেশকে দুর্যোগ প্রস্তুতিতে স্মার্ট প্রত্যয়ে প্রত্যয়ী করতে এসকেএস ফাউণ্ডেশন তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে। আমি "জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস ২০২৩" উপলক্ষ্যে দুর্যোগ মোকাবেলায় সবাইকে সচেতন ও প্রস্তুত থাকার আহবান জানাচ্ছি।

রাসেল আহম্মেদ লিটন
নির্বাহী প্রধান
এসকেএস ফাউণ্ডেশন

অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে আমাদের সক্ষমতা

শংকর কুমার রায়

বাংলাদেশে সচরাচর সংঘটিত দুর্যোগসমূহের মধ্যে ঘুর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, বন্যা, খরা, অগ্নিকাণ্ড উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন বিভাগসমূহ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত। পাশাপাশি সরকার কর্তৃক গৃহিত উদ্যোগসমূহকে প্রান্তিক পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা, সহযোগী সংস্থাসমূহ সরকারের সহযোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ বিশ্বে রোলমডেল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করলেও ক্রমাগত দুর্যোগের নতুন নতুন ক্ষেত্র, ব্যাপকতা ও ঝুঁকিবৃদ্ধি দেশের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতাকে প্রতিদিন নতুন নতুন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন করছে। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় আমাদের সক্ষমতা গড়ে উঠলেও দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে আমরা কাংখিত লক্ষ্যমাত্রা থেকে এখনও অনেক দুরে অবস্থান করছি। অতিসম্প্রতি ঘটে যাওয়া দেশের কয়েকটি বহুতল ভবনে অগ্নিকাণ্ডে উদ্ধার তৎপরতায় আমাদের দুর্লতাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় প্রাণ বাঁচাতে বহুতল ভবনের শীর্ষ থেকে লাফিয়ে অনেকের প্রাণ বাঁচানোর ব্যর্থ চেষ্টা আমরা লক্ষ্য করেছি। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর কর্মকর্তাগণের ভাষ্যমতে, সর্বোচ্চ ১২ তলা ভবন পর্যন্ত উদ্ধার তৎপরতা চালানোর মতো সরঞ্জামাদি আমাদের আছে কিন্তু তদূর্ধ্ব ভবনের উপরে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হলে প্রচলিত অর্থে উদ্ধার তৎপরতা চালানোর সক্ষমতা গড়ে ওঠেনি। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার মধ্যে সমন্বয়হীনতাও ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে বড় ধরণের অন্তরায়।

স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহের যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত সচেতনতাবৃদ্ধিমূলক কর্মসূচির ফলে বাংলার গ্রামীণ জনপদে অগ্নিকাণ্ডের সংখ্যা ও ব্যাপকতা হ্রাস পেলেও, নগর এলাকায় অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি ও ভয়াবহতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং যা উত্তোরোত্তর বেড়েই চলেছে। শহরাঞ্চলে অগ্নিকান্ডের ঝুঁকিবৃদ্ধির বহুবিধ কারণ রয়েছে, যার মধ্যে অপরিকল্পিত নগরায়ন ও ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধি অন্যতম। জলাধার ভরাট করে ভবন নির্মান করায় নগরাঞ্চলে পানি সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা থাকে না। ক্ষেত্রবিশেষে ভবন নির্মাণে যথাযথভাবে বিল্ডিং কোড অনূসরণ করা হয় না। অনেকক্ষেত্রে নির্মিত ভবনে অগ্নিনির্বাপনের প্রয়োজনীয় উপকরণ থাকে না; থাকলেও সেগুলো ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও প্রশিক্ষিত জনবলের অভাব পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও ভবনের বিদ্যুৎ ব্যবস্থপনায় যথাযথমানের বৈদ্যুতিক সামগ্রী ব্যবহার না করায় বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে অগ্নিকান্ড সংঘটিত হয়ে থাকে। বহুতল ভবনগুলোতে যথাযথ জরুরী নির্গমন পথ না থাকায় এবং আবাসিক এলাকায় শিল্পকারখানা নির্মাণ ও পরিচালনার ফলে অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। শিল্পকারখানার জন্য প্রয়োজনীয় বিপজ্জনক দাহ্য সামগ্রী নিরাপদ সংরক্ষণ ব্যবস্থা না থাকায় ঝুঁকির মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে আবাসিক এলাকাসমূহের রাস্তাঘাট এতটাই অপ্রশস্ত যে উদ্ধার তৎপরতা চালানো অত্যন্ত দুরূহ যা প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমান বৃদ্ধি করে। এজন্য ভবন/ প্রতিষ্ঠানের মালিকপক্ষের হীন মন-মানসিকতা ও বিভিন্ন দপ্তর ও বিভাগের মধ্যে সমন্বয়হীনতা অনেকাংশে দায়ী।

অন্যদিকে অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে যে ধরণের সক্ষমতা বা উদ্ধার তৎপরতা পরিচালনার দক্ষতা থাকা প্রয়োজন, নিয়মিত অগ্নিনির্বাপন মহড়া আয়োজন না করার কারণে প্রয়োজনীয় সক্ষমতাও গড়ে ওঠেনি।

এখনই অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি নিরসনে প্রণীত নীতিমালার যথাযথ প্রয়োগ, নীতিমালা সম্পর্কে সর্বসাধারণকে অবহিতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ ও নীতিমালা লংঘনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে আইনের আওতায় এনে শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যথায় অগ্নিকাণ্ডের ব্যাপকতা ও ভয়াবহতা দিন দিন বৃদ্ধি পাবে যা আমাদের জীবন ও সম্পদের ব্যাপক হানিসহ সার্বিক অর্জনকে ভূলুন্ঠিত করবে।

যথাযথ দুর্যোগ প্রস্তুতি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সহায়ক

এ. কে. এম আব্দুল মতিন

বিশ্বের দুর্যোগপ্রবণ দেশের তালিকায় প্রথম দশের মধ্যে বাংলাদেশের নাম। আবার দুর্যোগ প্রস্তুতি ও মোকাবেলায় আমার এ দেশ পথিকৃৎ। বাংলাদেশের দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিশ্বে 'মডেল' হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। মূলত ভৌগলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ যেখানে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সুস্পষ্ট। এ দেশের মূল দুর্যোগ বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়। মাঝেমধ্যে খরা বা অতিবৃষ্টি দুর্বিসহ পরিস্থিতি সৃষ্ট করে। ইদানিং বজ্রপাত দুর্যোগ আকারে আবির্ভূত হয়েছে। বিগত একশত বছরে বাংলাদেশে বড় ধরনের ভূমিকম্প সংঘটিত হয়নি। ফলে দুর্যোগ হিসেবে ভূমিকম্প ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়নি। তবে ভূমিকম্পের আশংকাকে মাথায় রেখেই সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহ সচেতনতামূলক প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে।। কখনও কখনও প্রস্তুতিমূলক আত্মরক্ষা ও উদ্ধার মহড়া আয়োজিত হচ্ছে।

কথা হচ্ছিলো "জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস" পালন নিয়ে। রাষ্ট্রীয়ভাবে সরকারি/বেসরকারি সংস্থাসমূহ সচেতনতামূলক বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে দিবসটি উদযাপন করছে। বাংলাদেশ ভাটির দেশ হিসেবে উজানের দেশ চীন, ভারত, নেপাল, ভুটান এবং মায়ানমার এর বৃষ্টির পানি ছোট-বড় প্রায় পাঁচ শতাধিক নদ-নদীর মাধ্যমে প্রতিবছর বাংলাদেশকে প্লাবিত করে সমুদ্রে নির্গত হচ্ছে। আবার দেশের দক্ষিণে উপকূলীয় অঞ্চল প্লাবিত হয় জলোচ্ছ্বাসে; সর্বশেষ যা ঘটে গেল গত ২৪শে অক্টোবর সিত্রাং- এর প্রভাবে। মৌসুমী বায়ুর দেশ হিসেবে ঘূর্ণিঝড় প্রতিবছরের সঙ্গী। এখন পর্যন্ত এ দেশে ভূমিকম্প সংঘটিত না হলেও গত ৬ ফেব্রুয়ারি তুরস্ক ও সিরিয়ায় ৭.৮ মাত্রার ঘটে যাওয়া ভূমিকম্পের ভয়াবহতা দেখে বড়ই ভয় হয়। রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশের বড় শহরগুলোতে যে সংখ্যক বহুতল ভবন অনিয়মতান্ত্রিকভাবে গড়ে উঠেছে, ভূমিকম্পে এসব ভবন ধসে পড়লে উদ্ধার কাজ ও পরবর্তী ব্যবস্থাপনা হবে দুরূহ। ভূতত্ত্ববিদরা বলছেন, ভূমিকম্পের জন্য দায়ী বেশ কয়েকটি প্লেট ও সাব-প্লেটের উপর বাংলাদেশের অবস্থান। তাই যে কোন মুহুর্তে ভূমিকম্প আঘাত হানতে পারে। তাদের মতে, সাধারণত প্রতি একশ বছর পর পর বড় ধরনের ভূমিকম্প হয়ে থাকে। বাংলাদেশের ইতিহাসে মধুপুর ফল্টে বড় ধরনের ভূমিকম্প হয়েছিল ১৮২২ এবং ১৯১৮ সালে। সেই হিসাব মতে যে কোন সময় বাংলাদেশে বড় ধরনের ভূমিকম্পের আশঙ্কা রয়েছে। ভূতত্ত্ববিদদের মতে তা হতে পারে সাত বা আট বা তারও বেশি মাত্রায়।

যুগ-যুগ ধরে দুর্যোগ মোকাবেলার অভিজ্ঞতাকে কৌশলে পরিণত করে, যথাযথ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াকে লিপিবদ্ধ করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক "দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি" রচিত হয় ১৯৯৭ সালে। পরবর্তীতে বাস্তব অভিজ্ঞার অসংযোজিত বিষয় এবং অভিজ্ঞজনদের পরামর্শ কর্মশালায় উত্থাপিত বিষয়কে পরিমার্জন ও সংযোজন করে বিভিন্ন সময় "দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি" আরও সমৃদ্ধ করা হয়েছে; যার সর্বশেষ সংস্করণ বের হয়েছে ২০১৯ সালে। ২০৩০ সময়সীমায় এসডিজির সফলতা অর্জনে এই আদেশাবলি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এই আদেশাবলিতে রাষ্ট্রের কেন্দ্র থেকে স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন স্তরের ক্ষুদ্রতম অংশ ওয়ার্ড পর্যায় পর্যন্ত সদস্যের ধরণ উল্লেখ রেখে বিভিন্ন স্তরে "দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি" গঠনের নির্দেশনা রয়েছে। শুধু তাই নয়, জেলা পর্যায়ে, উপজেলা পর্যায়ে, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা পর্যায়ে, ইউনিয়ন পর্যায়ে এবং ওয়ার্ড পর্যায়ে "দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ" গঠনের নির্দেশনা রয়েছে। দুর্যোগ বিষয়ক এই স্থায়ী আদেশাবলি বিশ্বে বেশ সমাদৃত হয়েছে। যদিও মাঠ পর্যায়ে বাস্তব প্রয়োগ এখনও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তাব্যক্তির মন-মর্জির উপর নির্ভরশীল রয়ে গেছে। এটা অনুমিত হয় আদেশাবলিতে নির্দেশিত পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে, বিভিন্ন স্তরের পরিকল্পনার মধ্যে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে এবং পরিকল্পনার বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে। আবার পরিলক্ষিত হয়, আদেশাবলির সর্বশেষ সংস্করণের উপর দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের দক্ষতার অভাব। অনেক ক্ষেত্রেই পরিকল্পনা দৃশ্যমান নয় যা প্রণয়নাধীন বা সংস্কারাধীন নামে কর্তাব্যক্তিদের মুখে মুখে প্রচারিত, অথবা শুধুমাত্র অফিস নথী হিসাবে সংরক্ষিত। তবে, কেন্দ্রের তথা মন্ত্রণালয়ের তাৎক্ষণিক নির্দেশক্রমে দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী পূনর্বাসন কর্মসূচি বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে বেশ জোরালোভাবেই পরিচালিত হয়। যেভাবেই হোক, দুর্যোগের আগাম সাড়াদান কর্মসূচি, দুর্যোগকালীন কর্মসূচি এবং দুর্যোগ-পরবর্তী পুনর্বাসন কর্মসুচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দুর্যোগের ঝুঁকি কমাতে এবং ঘূর্ণিঝড় থেকে জনগণের জানমাল রক্ষার জন্য "ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)" প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যার ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে "ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ড (সিপিপিআইডি)" গঠন এবং সক্রিয় করা হয় যার নির্দেশনা "দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি" তে উল্লেখ আছে। মানুষ ও গবাদি পশুর নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে নির্মিত মুজিব-কিল্লাকে সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। বহুমুখী ব্যবহার উপযোগী আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত "বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র" এবং আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস প্রদানের গুণগত মান উন্নয়নের কারণে ও দেশি-বিদেশি বেসরকারি সংস্থার সম্পৃক্ততায় প্রাণহানির পরিমাণ কমিয়ে সিঙ্গেল ডিজিটে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। জনগণকে দুর্যোগের আগাম সতর্কতা এবং নিয়মিত আবহাওয়ার বার্তা দিতে টোল ফ্রি ইন্টারেক্টিভ ভয়েস রেসপন্সিভ (আইভিআর) হটলাইন ১০৯০ চালু করেছে, যা ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, বজ্রপাত এবং জনগণের জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সক্ষমতা বিকাশে সহায়তা করছে। কিন্তু, প্রাণহানি কমলেও সম্পদ রক্ষায় অগ্রগতি কম। সঠিক সময়ে সরকারি-বেসরকারি সম্মিলিত প্রচেষ্টার বিচক্ষণ পদক্ষেপের অভাবে সম্পদ রক্ষা এবং মানব-সম্পদের সুরক্ষা ব্যাহত হচ্ছে। যেমন, মাঠ পর্যায়ে সতর্কীকরণ পূর্বাভাসের ভিত্তিতে "দুর্যোগ পূর্ব আগাম সাড়াদান পদক্ষেপ" পদ্ধতিকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে না, বা পরিকল্পনা প্রণয়নে বিষয়টিকে আমলে নেয়া হচ্ছে না। অথচ "দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৯" এ তার স্পষ্ট ইঙ্গিত করা রয়েছে। তবে আশার বিষয় এই যে, দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কমানোকে অগ্রাধিকার দিয়ে রাষ্ট্র "বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০" প্রণয়ন করেছে। নেয়া হয়েছে ভূমিকম্পজনিত দুর্যোগ মোকাবেলায় রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ। মন্ত্রণালয় বলছে, উদ্ধার কাজের সহায়তার জন্য ২০১৯ সালে কেনা হয়েছে ২২০ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি। আগামী জুনের মধ্যে আরো যন্ত্রপাতি হাতে পাবে বাংলাদেশ। অনুসন্ধান ও উদ্ধার কাজ এবং দুর্যোগ মোকাবেলা কার্যক্রম শক্তিশালী করতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ২৩০০ কোটি টাকা। কিন্তু ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর সাবেক মহাপরিচালক বলছেন, 'ভূমিকম্প মোকাবেলায় বাংলাদেশের প্রস্তুতি খুবই অপ্রতুল'। তাহলে কি মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয়হীনতা পরিলক্ষিত হচ্ছে না? মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে জানা যায়, ভূমিকম্প মোকাবেলায় ৩৬,০০০ প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক প্রস্তুত রাখা হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, তারা কি প্রস্তুতিমূলক আত্মরক্ষা ও উদ্ধার মহড়ার মাধ্যমে প্রশিক্ষিত, নাকি কোনো ভূমিকম্প বিধ্বস্ত দেশে আত্মরক্ষা ও উদ্ধার কাজে নিয়োজিত হয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত? তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নিয়ে কিছু সংখ্যক প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবককে তুরস্কে পাঠিয়ে সরাসরি উদ্ধার কাজে সহযোগিতার মাধ্যমে বাস্তবসম্মত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলে আমাদের দেশের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী আরও শক্তিশালী হতে পারতো।

যেভাবেই হোক না কেন এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া দুর্যোগে দুর্যোগকালীন ব্যবস্থাপনায় প্রাণহানির পরিমাণ কমে এসেছে। কিন্তু সেই অনুপাতে সম্পদ রক্ষায় অগ্রগতি কম। তাই, এখন দরকার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে প্রণীত "দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৯" অনুসরণ করে দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং কার্যকর করা। জানা যায়, বিভাগীয় পর্যায়ে এখনও "বিভাগীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি" গঠিত হয়নি। অতএব, আর কালক্ষেপণ না করে বিভাগীয় কমিটি গঠন করতে হবে এবং দুর্যোগ পরিকল্পনা প্রণয়নসহ সমস্ত দায়িত্ব সম্পাদন করতে হবে। ওয়ার্ড পর্যায়সহ সর্বস্তরের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে এবং দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপকে কার্যকর করতে হবে। দুর্যোগ পরিকল্পনা প্রণয়ন করছে কি না তা মনিটরিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে সর্বস্তরে উর্ধ্বতন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা রাখতে হবে। নীতিমালায় নির্ধারিত সময় অন্তর সভা অনুষ্ঠিত হতে হবে এবং সভার বিবরণী লিপিবদ্ধ করতে হবে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর (৪/৬ মাস পরপর) পর্যালোচনার ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রয়োজনে পরিকল্পনায় সংযোজন, বিয়োজন করতে হবে। অনুমোদিত পরিকল্পনা সকল সদস্যকে সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। দুর্যোগ কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি/বেসরকারি সংস্থা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা এবং দুর্যোগ পরিকল্পনা সংগ্রহ করতে চাইলে সরবরাহের সুষ্ঠু ব্যবস্থা রাখতে হবে। উক্ত সংস্থাসমূহ কোন পরামর্শ প্রদান করলে তা বিচার-বিশেণ্ডষণ সাপেক্ষে পরিকল্পনায় সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। জেলা দুর্যোগ অধিদপ্তর- এর নেতৃত্বে স্থানীয় সকল পর্যায়ের অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে একটি দুর্যোগ পরামর্শ দল গঠন করা যেতে পারে। তাঁরা সার্বক্ষণিক এলাকাভিত্তিক অবস্থা পর্যালোচনা করে এবং অনুমোদিত দুর্যোগ পরিকল্পনাকে বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে পরামর্শ দিবেন। গবেষণালব্ধ নতুন ধারণা অনুযায়ী প্রতিটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ ও স্বেচ্ছাসেবক দলকে "দুর্যোগ-পূর্ব আগাম সাড়াদান পরিকল্পনা প্রণয়ন" এর উপর প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং দুর্যোগ সতর্কীকরণ পূর্বাভাসের উপর ভিত্তি করে তাৎক্ষণিক প্রতিটি কমিটির দ্বারা একটি করে যথাযথ দুর্যোগ পূর্ব আগাম সাড়াদান পরিকল্পনা প্রণয়ন নিশ্চিত করতে হবে। প্রণীত দুর্যোগ-পূর্ব আগাম সাড়াদান পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্থায়ন ও লজিস্টিক সহায়তা এবং সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সমন্বয়ে দুর্যোগ প্রবণ এলাকার সকল ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারের একটি ডাটাবেইজ প্রণয়ন করতে হবে; যা উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে জেলা, বিভাগ ও কেন্দ্র কমিটিতে প্রেরণ এবং সংরক্ষণ করতে হবে। উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি বা প্রশাসন ডাটাবেইজ প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সহযোগী সংস্থার সহযোগিতা নিতে পারে। কোনো অনুদান বিতরণের সঙ্গে সঙ্গে ডাটাবেইজে এন্ট্রি দিতে হবে, যাতে পরবর্তী অনুদানের তালিকা প্রস্তুতের সময় একই ব্যক্তি বা পরিবার বারবার অনুদানের তালিকায় আসতে না পারে। প্রতি বছর এপ্রিল-মে মাসে ডাটাবেইজ হালনাগাদ করতে হবে।

শুধু "জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস" পালন নয়, সর্বস্তর থেকে প্রণীত নীতিমালায় উল্লেখিত নির্দেশাবলী চর্চার মাধ্যমে দুর্যোগ প্রস্তুতির পদক্ষেপসমূহকে শক্ত করতে হবে। নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দেশের প্রতি, দেশের মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধ অন্তরে জাগ্রত করতে হবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যথাযথ দুর্যোগ প্রস্তুতির মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের কারণে উত্তর উত্তর দুর্যোগের তীব্রতা বৃদ্ধি ও সৃষ্ট দুর্যোগসমূহের ঝুঁকি হ্রাস করা সম্ভব হবে।

বজ্রপাত থেকে বাঁচার প্রস্তুতি

মোঃ শফিকুল ইসলাম

বিশ্বের মানচিত্রে ভৌগলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ একটি দুর্যোগ-প্রবণ দেশ হিসেবে পরিচিত। বন্যা, খরা, নদীভাঙ্গন, কালবৈশাখী, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ মোকাবেলা করেই আমাদের দেশের মানুষকে টিকে থাকতে হয়। সাম্প্রতিক সময়ে দেশে বজ্রপাতের আধিক্য ও প্রাণহানিকে বিবেচনায় নিয়ে ২০১৬ সালে বজ্রপাতকে দুর্যোগ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

বজ্রপাত একটি প্রাকৃতিক ঘটনা। অঞ্চল ভেদে এর ভিন্ন ভিন্ন নামও রয়েছে। আঞ্চলিক ভাষায় কেউ একে বিজলী বা বিদ্যুৎ চমকানো কেউবা ঠাটা নামে ডাকে। বাস্তবে বজ্রপাত প্রকৃতির একটি অস্বাভাবিক আচরণ। এই অস্বাভাবিকতার কারণ হচ্ছে, বায়ুমণ্ডলে কালো মেঘ বেড়ে যাওয়া। কালো মেঘ সৃষ্টির পেছনে বাতাসে নাইট্রোজেন ও সালফারের পরিমাণ বাড়াকেই দায়ী করছেন বিজ্ঞানীরা। জলবায়ু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পৃথিবীতে প্রতি মিনিটে ৮০ লাখ বজ্রপাত সৃষ্টি হয়। উন্নত দেশগুলোতেও এক সময় বজ্রপাতে অনেক মানুষের মৃত্যু হতো। কিন্তু তারা বজ্রনিরোধক খুঁটি বা পোল স্থাপন করে, মানুষকে সচেতন করার মধ্য দিয়ে ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে এনেছে। সম্প্রতি বাংলাদেশসহ পৃথিবীজুড়ে বজ্রপাতে প্রাণহানির সংখ্যা বেড়েছে। বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে অন্তত ৪০টি বজ্রপাত হয় বলে আন্তর্জাতিক গবেষণায় উঠে এসেছে।

বাংলাদেশে বর্তমানে বজ্রপাতের ব্যাপকতা জনজীবনকে ভাবিয়ে তুলেছে এবং ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে এখন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ কিংবা ডাটাবেইজ সৃষ্টিতে কর্তৃপক্ষ তৎপর। সরকারি পর্যায়ে ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন এনজিও, গণমাধ্যম কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যে দেখা যায়, ২০১০ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত সারা দেশে বজ্রপাতে প্রায় তিন হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে এবং ২০১১ সালের পর থেকে এর প্রবণতা ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে। বজ্রপাতে বাংলাদেশে প্রতিবছর গড়ে প্রায় ২৫০ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়।

সাল	মৃতের সংখ্যা
২০১১	১৭৯
২০১২	২০১
২০১৩	১৮৫
২০১৪	১৭০
২০১৫	২২৬
২০১৬	৩৯১
২০১৭	৩০৭
২০১৮	৩৫৯
২০১৯	১৯৮
২০২০	২৫৫
২০২১	৩৬৩

এত বেশি মৃত্যু হারের জন্য মানুষের অসচেতনতাকেই দায়ী করছেন বিশ্লেষকরা। তারা বলছেন, বজ্রপাত সম্পর্কে দেশের প্রান্তিক জনসাধারণের সঠিক ধারণা না থাকার কারণে মৃত্যুহার বেশি। ঝড়-বৃষ্টি, বজ্রপাতের সময়ও এ দেশের লোকজন খোলা জায়গায় কাজ করে বিশেষ করে চর ও হাওড়াঞ্চলের কৃষক ও জেলে সম্প্রদায়।

দেশের নীতি-নির্ধারকরা ২০১৬ সালে বজ্রপাতকে দুর্যোগ হিসেবে ঘোষণা করে এর প্রতিকারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলেন। তখন এক কোটি তালগাছ লাগানো এবং বৈদ্যুতিক খুঁটিতে বজ্রনিরোধক যন্ত্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন পেরিয়ে গেলেও সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত হয়নি। ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রনালয় কর্তৃক জমির আইলে এবং রাস্তার দুইধারে তালগাছ লাগানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। সে সময় উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার তত্ত্বাবধায়নে এবং ইউনিয়ন পরিষদের সহায়তায় কিছু তালগাছ রোপন করা হলেও প্রয়োজনীয় তদারকি, অসচেতনতা এবং সঠিক পরিকল্পনার অভাবে সেগুলো বেড়ে উঠতে পারেনি। তাছাড়া এটি একটি দীর্ঘ মেয়াদি বিষয়। কারণ তালগাছ বড় হতে কয়েক যুগ সময় লেগে যায়।

অন্যদিকে, দেশের বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রছাত্রীরা দিনের অনেকটা সময় ধরে বিদ্যালয়ে অবস্থান করে। বিদ্যালয়গুলোতে সাধারণত বজ্রপাত থেকে সুরক্ষার কোন ধরণের প্রতিরোধক ব্যবস্থা নাই। বজ্রপাতের কারণে বিদ্যালয়ে নিহত বা আহতের সঠিক পরিসংখ্যান না থাকলেও বিভিন্ন সূত্রমতে, জুন-সেপ্টেম্বর ২০২২, এ সময়ে ৪টি জেলায় ৮ জন ছাত্রছাত্রী বজ্রপাতে মারা যায়। আহত হয় অর্ধ-শতাধিক। বাংলাদেশ সরকার বিদ্যালয়ের অবকাঠামো খাতে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করলেও প্রকৌশল বিভাগের সচেতনতার অভাবে অথবা কাঠামোর অন্যান্য বিষয় বা সৌন্দর্যের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপের কারণে বজ্রপাত থেকে শিশুদের রক্ষার বিষয়টি নকশায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। অনেক সময় সামান্য বিষয় ভেবে মূল নকশায় এটি গুরুত্ব পায়নি। ফলে ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তার বিষয়টি অবহেলিতই থেকে যাচ্ছে।

দেশের চরাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোতে বজ্রপাতের ঝুঁকি অনেক বেশি। চরাঞ্চলের অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জনপদের কথা বিবেচনায় নিয়ে কোন কোন বিদ্যালয়ে বজ্রপাত প্রতিরোধক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে এবং তার সুফলও পেয়েছে ছাত্রছাত্রীরা। লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা দুর্যোগকবলিত উপজেলাগুলোর অন্যতম। বন্যাকবলিত এলাকা হওয়ায় এখানকার বিদ্যালয়গুলোর অবকাঠামোগত অবস্থাও নাজুক। বর্ষা মৌসুমে এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের সাথে প্রচুর বজ্রবৃষ্টি হয়। বজ্রবৃষ্টি বিদ্যালয়ে উপস্থিতির ব্যাপারে ছাত্রছাত্রীদের ও তাদের অভিভাবকদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাড়ায়। ছাত্রছাত্রীসহ শিক্ষকগণ থাকেন নিরাপত্তা ঝুঁকিতে। পরিস্থিতি বিবেচনায়, এসকেএস ফাউণ্ডেশন ২০১৫_২০১৯, এই ৫ বছর হাতীবান্ধা উপজেলায় 'নিরাপদ বিদ্যালয় প্রকল্প' নামে একটি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। প্রকল্পের অধীণে এসকেএস ফাউণ্ডেশন বিদ্যালয়ে বর্ষা মৌসুমে আপদকালীন সময়ে শিক্ষা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি বজ্রপাত থেকে ছাত্রছাত্রীদের সুরক্ষার জন্য দুর্যোগ প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ২১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বজ্রনিরোধক দণ্ড স্থাপন করে। বজ্রনিরোধক দণ্ড স্থাপনের ফলে প্রত্যন্ত চরাঞ্চলে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মনে সাহস সঞ্চারিত হয়েছে। তাদের সুরক্ষা যেমন নিশ্চিত হয়েছে, তেমনি বিদ্যালয়ের বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদির সুরক্ষাও নিশ্চিত হয়েছে। বজ্রনিরোধক দণ্ড দুইভাবে কাজ করে, এটা বজ্রপাতকে তারের মধ্যে দিয়ে এনে মাটিতে নামিয়ে দেয় এবং এটা থেকে বিপরীত চার্জ মেঘের চার্জকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। বিদ্যালয়ে বজ্রনিরোধক দণ্ড স্থাপনের ফলে ২৫টি বিদ্যালয়ের প্রায় ১০,০০০ ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়ে নিরাপদে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে।

বজ্রনিরোধক দণ্ড স্থাপনের পাশাপাশি এসকেএস ফাউণ্ডেশন বজ্রপাতের প্রভাব এবং বজ্রনিরোধক দণ্ড সম্পর্কে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সচেতনও করেছে। শ্রেণিকক্ষে পড়ানোর পাশাপাশি বিদ্যালয়ের দেয়ালে লেখা হয়েছে সচেতনতামূলক বার্তা। সাইনবোর্ড, ফেষ্টুন আকারে বজ্রপাতে করণীয় সম্পর্কে বার্তা প্রচার করা হয়েছে স্থানীয় গ্রামগুলোতে। বজ্রবৃষ্টি ও বজ্রপাতের সময় করণীয় সম্পর্কে প্রচারিত সচেতনতামূলক বার্তাগুলি নিম্নরূপঃ

- বজ্রপাতের সময় খোলা জায়গা, খোলা মাঠ অথবা উঁচু স্থানে অবস্থান করা যাবে না।
- বজ্রপাতের সময় শিশুদের খোলা মাঠে খেলাধুলা থেকে বিরত রাখতে হবে।
- বজ্রপাতের সময় ধানক্ষেত বা খোলা মাঠে থাকলে তাড়াতাড়ি পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে এবং কানে আঙুল দিয়ে মাথা নিচু করে বসে থাকতে হবে।
- বজ্রপাতের সময় সমুদ্র বা নদীতে থাকলে মাছ ধরা বন্ধ রেখে নৌকার ছাউনির নিচে অবস্থান করতে হবে।
- যত দ্রুত সম্ভব দালান বা কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিতে হবে। টিনের চালা যথাসম্ভব এড়িয়ে চলাই ভাল।
- উঁচু গাছপালা ও বৈদ্যুতিক খুঁটি ও তার বা ধাতব খুঁটি, মোবাইল টাওয়ার থেকে দূরে থাকতে হবে। কালো মেঘ দেখা দিলে নদী, পুকুর, ডোবা বা জলাশয় থেকে দূরে থাকতে হবে।
- বজ্রপাতের সময়ে বাড়িতে থাকলে জানালার কাছাকাছি ও বারান্দায় থাকা যাবে না। জানালা বন্ধ রাখতে হবে এবং ঘরের ভেতরে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম থেকে দূরে থাকতে হবে।
- বজ্রপাতের সময় মোবাইল, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, ল্যান্ডফোন, টিভি, ফ্রিজসহ সব বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে এবং এগুলো বন্ধ রাখতে হবে।
- খোলা স্থানে অনেকে একত্রে থাকা অবস্থায় বজ্রপাত শুরু হলে প্রত্যেকে ৫০ থেকে ১০০ ফুট দূরে অবস্থান করতে হবে।
- বজ্রপাতে কেউ আহত হলে বৈদ্যুতিক শকে আহতদের মত করেই চিকিৎসা করতে হবে। প্রয়োজনে দ্রুত চিকিৎসককে ডাকতে হবে বা হাসপাতালে নিতে হবে।
- প্রতিটি বিল্ডিং বা বাড়িতে বজ্র নিরোধক দণ্ড স্থাপন করতে হবে।

বজ্রপাতে মৃত্যুর সংখ্যা কমিয়ে আনতে উপরোক্ত সচেতনতামূলক কার্যক্রমসমূহ একান্ত জরুরি এবং হাতিবান্ধা উপজেলার বিদ্যালয় ও গ্রামগুলোতে মানুষের মধ্যে সচেতনতা ও স্বস্তি এনেছে। এসকেএস ফাউণ্ডেশন- এর বাস্তবায়িত বিদ্যালয়ে বজ্রনিরোধক বার্তা প্রচার ও দণ্ড স্থাপন সরকারি-বেসরকারিভাবে প্রশংসিত হয়েছে। বিষয়টি জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন সেমিনারে উত্থাপিত হলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও বিভিন্ন পর্যায়ের অংশীজন জনসচেতনতার পাশাপাশি অবকাঠামো খাতে বজ্রনিরোধক দণ্ড অন্তর্ভুক্তি জরুরি হয়ে দাড়িয়েছে বলে মতামত ব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ১ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে এক প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, ২০২১-২০২২ বছরে বজ্রপাতে প্রাণহানী রোধকল্পে লালমনিরহাটসহ বজ্রপাত-প্রবণ ১৫টি জেলায় বজ্রনিরোধক দণ্ড স্থাপনের লক্ষ্যে ১৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৫টি জেলার ১৩৫টি উপজেলায় ৩৩৫টি বজ্রনিরোধক দণ্ড স্থাপন করা হয়েছে। নিশ্চয়ই এটি স্বস্তির খবর। তবে সরকারিভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও সারাদেশের প্রয়োজনের বিচারে এটি সীমিত। এজন্য সরকারি-বেসরকারি সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। বিশেষকরে বজ্রপাত-প্রবণ জেলাগুলোর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বজ্রনিরোধক দণ্ড স্থাপন জরুরি হয়ে পড়েছে। প্রতি বছর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন (নতুন ভবন তৈরি এবং পূরোনো ভবন সংস্কার) খাতে রাষ্ট্রীয়ভাবে বড় বাজেট ব্যয় করে থাকে। অবকাঠামো উন্নয়নে বিল্ডিং কোডের সাথে বজ্রনিরোধক দণ্ড বাধ্যতামূলক করলে ডিজাইনের মধ্যেই এটি অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। অতিরিক্ত অর্থ প্রয়োজন হবে না। দরকার শুধু উদ্যোগ গ্রহণ।

সরকার প্রতিবছর চরাঞ্চল বা ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় আশ্রয় বেন্দ্র বা বিদ্যালয় কাম আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করে থাকে। এক্ষেত্রেও বিল্ডিং কোডের সাথে বজ্রনিরোধক দণ্ড বাধ্যতামূলক করা হলে চরাঞ্চল বা উপকূলীয় মানুষের বজ্রপাতের সময় নিরাপদ আশ্রয় তৈরি হবে এবং বজ্রপাতে মৃত্যুহার কমে আসবে। এজন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের সাথে এডভোকেসি করা যেতে পারে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহও এগিয়ে আসতে পারে। কর্পোরেট সেক্টরেরও এখানে অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে। তারা কারিগরি সহযোগিতাসহ সচেতনতামূলক কাজে অবদান রাখতে পারে। যেহেতু বজ্রপাত একটি জাতীয় দুর্যোগ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে এবং ইউনিয়ন পরিষদসমূহ সামাজিক নিরাপত্তাসহ মানুষের উন্নয়নে কাজ করে থাকে, বজ্রপাত-প্রবণ এলাকার ইউনিয়ন পরিষদসমূহ তাদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় বজ্রনিরোধক দণ্ড স্থাপনের কাজ অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে মানুষের মৃত্যুহার কমিয়ে আনতে সহায়তা করতে পারে। এক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের উন্মুক্ত বাজেট আলোচনায় বিষয়টি জোরালোভাবে উত্থাপনের দাবি রাখে। পাশাপাশি এনজিওসহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারগণ স্থানীয় সরকারের বাজেট কাঠামোতে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে লবিং করতে পারেন। স্থানীয় পর্যায়ে আর্থিকভাবে সক্ষম/সচেতন ব্যক্তিগণ তাদের পরিবারের সদস্যদের সুরক্ষার জন্য নিজস্ব বাসা/বাড়িতে বজ্রনিরোধক দণ্ড স্থাপন করতে পারেন। আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা বজ্রপাত-প্রবণ এলাকা বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বজ্রনিরোধক দণ্ড স্থাপনসহ ছাত্র-ছাত্রীসহ এলাকার মানুষের বজ্রপাতে মৃত্যুহার হ্রাসে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি।

সম্পাদক: কে এম রেজাউল হক, প্রকাশক: রাসেল আহম্মেদ লিটন কর্তৃক এসকেএস প্রিন্টার্স, গাইবান্ধা থেকে মুদ্রিত ও সাবেক বিজেএমসি ভবন, শনিমন্দির রোড, গাইবান্ধা থেকে প্রকাশিত।
সার্কুলেশন: ০১৭০১৭৬৪৮৩০, e-mail: dailymadhukar@gmail.com